আন্তর্বিদ্যা

www.debracollege.ac.in

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812701

‘দেশভাগ’: অসময়ের সংলাপ

সুরজিৎ বেহারা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (DODL)

Submitted on: 24.04.2024

Accepted on 20.03.2025

সংক্ষিপ্তসার- *ইতিহাসের নির্মাণ এই নতুন শতাব্দীতে কেবল লিখিত দলিলের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। ইতিহাসকে চেনার নিত্য নতুন অভিমুখ গড়ে উঠেছে ; যে পদ্ধতিতে ভর করে আমরা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ এক-একটি চরিত্রকে নতুন করে বুঝে নিতে চেষ্টা করি। ‘দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা’- গ্রন্থটিতে তেমনই একটি প্রচেষ্টা চোখে পড়বে। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে একটি পরিবার, যাদের মাথার ওপরে কোনো পুরুষ অভিভাবক ছিল না শেষ চারটি প্রজন্ম ধরে, তাঁদের জীবনযুদ্ধের বয়ান এই আখ্যান। যেখানে এক ছিন্নমূল মা তার সাত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে একক প্রচেষ্টায় নতুন করে বাঁচার পথ তৈরি করেছিলেন। দেশভাগ-উদ্বাস্তু জীবন সমস্যার ডকুমেন্টগুলি ওরাল ফর্ম থেকে সরাসরি সংগ্রহের যে মেথড্ লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন, তার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের আকর উপাদানসমূহ সরাসরি বয়ান আকারে উঠে আসে। যে আখ্যান শেষ পর্যন্ত কেবল উদ্বাস্তু জীবনের বিপর্যয়গুলি দেখায়নি বরং নতুন করে ঘর বাঁধার নির্দেশিকাও দিয়েছে।*

সূচক শব্দ- *দেশভাগ, কাঁটাতার, ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু, প্রত্যাবর্তন, জীবনযুদ্ধ*

সে এক অসম্ভব অ-সময়ে টিকে থাকা মানুষগুলোর কথা। এমন চার প্রজন্মের কথা, যে প্রজন্মগুলির ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন কেবল বিধবা নারীরা। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এমন কোনো সমর্থ পুরুষ বেঁচে ছিলেন না। তাঁদেরই শেষ প্রজন্মটি পেরিয়ে এসেছেন দেশভাগ-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- লুঠপাটের সব অ-সম্ভব পটভূমি। এর মাঝেই ছয়টি অপ্রাপ্ত বয়স্কা নারী সেই ধ্বংসলীলা পাশ কাটিয়ে পুব বাংলার নিজস্ব অট্টালিকা ছেড়ে পা বাড়াচ্ছেন আরও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। সত্যিই এ-এক অসম্ভব অ-সময়েরই 'কথা'। তবুও আর পাঁচটা ঘটনার মতো এই বৃত্তান্ত আটপৌরে নয়। তা না-হলে 'কথা' হয়ে উঠত না সেগুলো। ঠিক যেমন উর্বশী বুটালিয়া তাঁর 'The Other side of Silence' বইটিতে মানুষের টুকরো স্মৃতিকথা জুড়ে জুড়ে দেশভাগের একটি ন্যারেটিভ তৈরি করেছিলেন; সে-ভাবেই যেন এই গ্রন্থের লেখক বলে চলেছেন - কী অসীম কষ্ট সহ্য করে তাঁর পূর্ব প্রজন্মের এক মা একটি সন্তান ও ছয় সন্ততি সঙ্গে নিয়ে 'নিজের' মাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবির এড়িয়ে এসে 'বাসা' গড়লেন কৃষ্ণনগরের প্রান্তবর্তী জঙ্গলে ঘেরা একটি পোড়ো বাড়িতে। এখান থেকেই নতুন এক লড়াই শুরু

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812701

হবে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে! কেবল গায়ের কাপড় আর পেটের ভাত-ই তো শেষ কথা নয়, শিক্ষাও চাই তাঁদের। এই অ-সম্ভব চ্যালেঞ্জের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সেইসব প্রমীলার জীবন সংগ্রামের কথাই শুনিয়ে চলেছেন 'দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা'(গাঙচিল,২০২০) বইটির লেখক সুমনা দাস সুর।

২

ইতিবৃত্তের ভেতরে মিশে থাকা আরও একটি গল্পের আশ্চর্য সংকেতের মধ্য দিয়ে আখ্যানটি শুরু হলো। চুনি-ফিরোজা-মুক্তো দিয়ে গোছানো একটি প্রজাপতি লকেট! মেয়েবেলায় অনুষ্ঠানবিশেষে সোনার চেনের সঙ্গে ঝুলিয়ে সেই লকেট কেবল লেখকই পড়তেন না, তাঁর অন্যান্য তুতো বোনের গলাতেও তেমনই অলংকার শোভা পেত। ক্রমশ জানা যাবে, এইগুলি কোনো স্বতন্ত্র অলংকার নয়। আসলে একটা বড়ো নেকলেসের প্রান্তবর্তী অংশবিশেষ। অভাবের দায়ে সেই অলংকার বিক্রির সময় এগুলি খুলে রাখা হয়েছিল। এখান থেকেই একটি তাৎপর্য প্রকাশ হয়ে উঠতে চায়; টুকরো হয়ে যাওয়া আরও অন্যান্য প্রজাপতি থেকে আজ পাথরগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে! তার অর্থ, অস্পষ্ট হয়ে আসছে একটা ফেলে আসা,অলিখিত সময়ের ইতিহাস। কিন্তু তাকে তো হারিয়ে ফেলা যায় না! লেখকের কথায় -

> 'প্রজাপতি লকেটটা ভাঙতে ভাঙতে, বদলাতে বদলাতে লীন হয়ে গেলেও সেই দায় কার!
> যাদের হাতে সেটি পৌঁছেছে, তাকে রক্ষা করার দায়ও কি সেই উত্তর প্রজন্মের নয়?' (পৃ. ১১)

সেই ছয় বোনের মধ্যে 'আজ' জীবিত চারজনের তিনজনকে একসঙ্গে বসিয়ে লেখক সংলাপ শুরুর উদ্যোগ নেন। (যেটি ইতিহাস পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিনব পন্থাও বটে।) সেখান থেকেই সৃষ্টি হবে এই অ-সম্ভব আখ্যানের। ঠিক যেমন সেই নৈঃশব্দ্যের অপর মেরু- রচনাটি। নারীরা তাদের স্বামী-সন্তানের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন নিজেদের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছিল। তবুও হয়তো খুঁজলে দেখা যেত, সেখানে নিহিত আছে নেকলেস ভেঙে যাওয়ার মতোই জীবন ভাঙনের কিছু গোপন ইস্তেহার! তবে সেই বিস্মৃতির ট্র্যাজেডি এখানে নেই। কারণ, এই গ্রন্থের লেখক বুঝেছিলেন- নারীর নৈঃশব্দ্যে লেখা ইতিহাসের ভেতরেই অতীত যন্ত্রণার মূল লুকিয়ে থাকে। সেই সত্য তো আমাদেরই খুঁড়ে বের করে আনতে হবে।

প্রথমত, 'দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা' তাই অনিবার্যভাবেই পরাগত সময় এবং অন্যতর এক বেঁচে থাকার দিনপঞ্জিকে পুনরায় আবিষ্কার করার গল্প।

দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গেই দেশভাগ-উদ্বাস্তু জীবন সমস্যার ডকুমেন্টগুলি ওরাল ফর্ম থেকে সরাসরি সংগ্রহের যে মেথড্ লেখক এখানে ব্যবহার করেছেন, তার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের আকর উপাদানসমূহ সরাসরি বয়ান হিসাবে উঠে এসেছে। যাতে প্রক্ষেপনের অবকাশ থাকে না।

তৃতীয়ত, ইতিহাসের কোনো সংবেদনশীল ঘটনা নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে লিখিত দস্তাবেজগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও কালান্তরে সেই রচনাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত- মতানৈক্য ইত্যাদি এসেই পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্ররা যখন মুখোমুখি বসে কথা বলছেন তখন, তথ্যের থেকেও টেমপারামেন্টগুলি বেশি তাৎপর্যময়। কারণ সেই ইতিহাসের আগুন এক-একজনকে ভিন্নভাবেই ছুঁয়ে গেছে। এই অনুভূতির দ্রবণসমূহ আমাদের আলোচ্য টেক্সটটির অন্যতম পাওয়া। পাঠক সেখানে ইতিহাস ও অনুভূতির যৌগ পদ্ধতিতেই একটা ফেলে আসা সময়কে চিনে নিতে সক্ষম হবেন।

৩

এই গল্পেরও একটা শুরু আছে। পরিবারের আদি পুরুষ বিপিন রায় ঢাকার বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী সদরঘাট অঞ্চলের একজন ধনী মানুষ ছিলেন। তাঁর জন্ম আনুমানিক উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে। জীবিকা ছিল, ব্রিটিশ কোম্পানির

তৈরি কাচের ঝারবাতি বিক্রির রিপ্রেজেন্টেটিভ। এই সূত্রেই বড়ো বড়ো রাজা-জমিদারদের সঙ্গে আলাপ। যে আলাপ ব্যক্তিগত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গে'ছিল; তাঁদের চিকিৎসা-তীর্থভ্রমণ এইসবের ব্যবস্থা করে দেবার মাধ্যমে। ফলে উত্তরোত্তর পারিবারিক সমৃদ্ধি। বুড়িগঙ্গার কাছে বিপিন রায়ের বসত-ভিটা। অর্থ-সমৃদ্ধির জোয়ার এলে আরও তিনটি বাড়ি ক্রয় করেন তিনি। সেগুলি ভাড়ায় দেওয়া হয়। প্রথম স্ত্রীর দুই কন্যা বিধুমুখী এবং শশিমুখী। প্রথম পক্ষ গত হলে তিনি সরলাসুন্দরীকে বিবাহ করেন, যিনি নিঃসন্তান ছিলেন। অথচ 'সময়' কালের নিয়মে বদলাতে থাকে। প্রথমে কন্যা শশিমুখী বিধবা হয়ে সন্তান রাধারানিকে সঙ্গে নিয়ে বাপের ঘরে উঠে এলেন। তাদের খরচ উঠে আসত সে-সব বাড়ি ভাড়ার টাকা থেকে। বড়ো মেয়ে বিধুমুখী স্বামী-সন্তান নিয়ে ছিলেন শ্বশুরঘরেই। এবার সংসারের হাল ধরেন বিপিনের দ্বিতীয়পক্ষ সরলাসুন্দরী। দেখা গেল রাধারানিও কোলে কন্যা সন্তান নিয়ে সিঁদুর-লাঞ্ছিতা হলেন। বিপিনের সংসার সেই থেকে অন্ধকারের দিকে পথ হাঁটা শুরু করল। স্বামীর তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পদ বেহাত হয়ে যাক, তা বর্ষিয়সী সরলাসুন্দরী চাননি। অগত্যা হতভাগ্য তৃতীয় প্রজন্ম অর্থাৎ রাধারানির কন্যা সুভাষিণীর সঙ্গে বিপিন-গৃহিনী সরলা বিবাহ দিলেন তার ভাইপো রাধেশ্যামের। রাধেশ্যাম বিপিন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সঙ্গে সম্পত্তি তদারকিও। রাধেশ্যাম-সুভাষিণীর এক পুত্র ও ছয় কন্যা। কিন্তু সময় যেন অনাসৃষ্টির অন্ধকারকে কিছুতেই অতিক্রম করে উঠতে পারছিল না। ১৯৪৯ সালে পনেরো দিনের জ্বরে রাধেশ্যামও গত হলেন! একদিকে দেশভাগ মানুষকে ছিন্নমূল করছে আর অন্যদিকে- সরলাসুন্দরী, শশিমুখী, রাধারানি এবং সুভাষিণী; হতভাগ্য এই চার নারী প্রজন্মের মাথার ওপর থেকে চিরকালের জন্য মুছে গেছে পুরুষ অভিভাবকের হাত! ফলে লড়াই দুদিক থেকেই যে ভীষণ, তা অনুমান করে নেওয়া যায়। সব শেষে মাটি ছেড়ে চলে যাওয়া...

একটি পরিবারের উত্থান-পতনের তরঙ্গভঙ্গে এই 'দেশভাগ' গ্রন্থটি অন্তর্মুখী সময় সংকেতের ভাষ্য গড়ে দিয়েছে। যে দলিল কোনো সমাজ ঐতিহাসিকের লেখা নয়। বরং হতভাগ্য চার প্রজন্মের নারীই (যেন) ইতিহাসের অনালোচিত অধ্যায় থেকে উঠে এসে আমাদের সে-সব কথা শুনিয়ে চলেছেন।

৪

চার ফর্মার এই বইটি কেবল দেশভাগের দলিল নয় বরং ছিন্নমূল একটা সময়কে অসহায় নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝাপড়া করার প্রয়াস। সেই যে সুভাষিণী ও রাধেশ্যামের সাত ছেলে-মেয়ের কথা বলা হয়েছিল (সরযূবালা, রাধাকান্ত, কানন, কমলা, বিমলা, অণিমা এবং মালা); তাঁদের মধ্যে কমলা, অণিমা (লেখকের মা) এবং মালা এই তিনজন নারী গোটা আখ্যানজুড়ে বিচিত্র পরিসরে তাঁদের অতীত-কথা রোমন্থন করে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে খণ্ডিত একটা সময়ের রঙবাহার; যার অনেকটাই বিবর্ণ। তবু তার ভেতরে চুনি-ফিরোজা-মুক্তো বসানো সেই প্রজাপতি লকেটটার মতো একটা কোমল আলোর আস্কারা ছিল। স্পর্ধাও! না হলে এতটা পথ তাঁরা অতিক্রম করলেন কেমন করে? সেই সরলাসুন্দরী, যিনি একাধিপত্য খাটিয়ে বাড়ির সদস্যদের অন্ন পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারতেন। যাতে সহায় সম্পত্তি প্রথম পক্ষের কন্যা বিধুমুখীরা না দাবি করতে পারেন, তাই রাধারানির কন্যা সুভাষিণীর সঙ্গে নিজের ভাইপো রাধেশ্যামের বিয়ে পর্যন্ত তাঁরই উপস্থিত বুদ্ধির জোরে হয়েছিল। আবার কমলা বলছেন, তিনি তাঁর বড়োমা- দিদিমাদের আজীবন বৈধব্যের বেশেই দেখেছিলেন। তখন সরলাসুন্দরীরা আবার অন্য নারী। অণিমা জানাচ্ছেন, সেই ভাগ্যাহত নারীরা (শশিমুখী, রাধারানি) সংস্কারের বশে নিজেদের চুল নিজেরাই কেটে নিতেন; অথচ কখনই কোনো রঙের স্পর্শ তাদের গায়ে লাগতে দেননি। আশ্চর্য হতে হয়, সতেরো-আঠারো বছর বয়সে যাঁরা স্বামীহারা হলেন- তারা পরবর্তী এতটা জীবন ধরে প্রব্রজ্যা পালন করে চললেন কী ভাবে? আবার এর ফাঁক দিয়েই আখ্যানে উঁকি দিয়ে যায় পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের স্মৃতি। অণিমা

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812701

শুনেছেন, গৃহকর্তা বিপিন রায় শৌখিন জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মসমাজে আসা-যাওয়া ছিল তাঁর। অথচ প্যারাডক্স যে,

> ' ... সেই আলো বাড়ির মেয়েদের মধ্যে নিয়ে আসার, তাঁদের পড়াশোনা বা সংসারের বাইরে অন্য কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা তিনি কখনো করেননি।' (পৃ:.২৩)

তবুও তাঁরা জিতাক্ষরা। তৃতীয় প্রজন্মের সুভাষিণী (কমলার উচ্চারণে - 'আমাদের মা') সেই যুগেও ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিলেন। চতুর্থ প্রজন্মের বড়ো মেয়ে সরযূ বা পরের জন কানন পূর্ববঙ্গের গেণ্ডারিয়া গার্লস হাইস্কুলে পড়েছেন। তৃতীয় কন্যা কমলা বলছেন,' আমি যেতাম প্রাণবল্লভ মাস্টারের পাঠশালায়।' এবং ইতিহাস বলছে, সময়টা ১৯৪৫-৪৬। চারিদিকে অশান্তি-অস্থিরতার প্রতিকূলে দাড়িয়েও ওঁরা বুকে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। কেবল আভিজাত্য বা কৌলীন্য নয়, পড়াশোনাটাও যে খুব দরকার! অথচ বাইরেটা বীভৎস! কমলারই উচ্চারণ, '১৯৪৫-৪৬ সাল হবে সেটা।... চারিদিকে অশান্তি, অস্থিরতা। যখন-তখন যেখানে -সেখানে মারদাঙ্গা লেগে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট আর মেয়েদের চলাফেরার জন্য নিরাপদ রইল না।'(পৃ.২৪) তাই স্কুল ছাড়তে হলো তাদের। এবং বড়ো দাদা বা একমাত্র পুত্র সন্তান রাধাকান্তের বয়স যখন সবে ষোলো, তাঁদের পিতা অর্থাৎ সুভাষিণীর স্বামী রাধেশ্যামও ম্যানেনজাইটিসে মারা গেলেন। একটি পরিবারও যেন হতভাগ্য পূর্ববঙ্গের মতোই হয়ে পড়ল চিহ্নহীন। ১৯৪৯ সাল। এই তৃতীয় প্রজন্মের নারীরা অসহায়ভাবে তখনও পূর্ব পাকিস্তানে। লোহারপুর, সূত্রাপুর তাঁদের বাড়ির কাছেই; এ-সব জায়গায় দাঙ্গা হচ্ছে। কমলার স্মৃতি এবার ইতিহাসের বিশ্লেষণে রত। তিনি জানাচ্ছেন, লুঠপাট-দাঙ্গা এসব বিহারী মুসলমানেরা বাঁধাত। বাঙালি মুসলমান নয়। তাঁদের আত্মীয়বর্গের একাংশ কলকাতায় চলে গেছে আগেই। এদিকে প্রতিটা দিন আশংকায় কাটছে ! লুঠেরা দল, যে বাড়িতে মেয়েরা আছে সে-সব বাড়িতেই আক্রমণ করছে বেশি। রানি নামের এক কিশোরীর দাদুকে ডাকাতেরা ছুরি মারে। লেখকদের বাড়ির বাক্স-তোরঙ্গ-শাড়ি সব লুঠ হয়ে যায়। বস্ত্রের অভাব যেন আরও এক 'দুঃশাসনীয়' গল্পের জন্ম দেবে! তবে তারপরেও সুভাষিণী চার প্রজন্মের কয়েকশো ভরি গহনা ঠিক আগলে রাখতে পেরেছিলেন। এই নিয়েই তাঁদের আগামীর পথ চলা বা পথ বদল বলা যায়। অণিমা জানাচ্ছেন, তারা ঘর ছাড়ছেন ১৯৫০ এর এপ্রিল -মে মাসে। কিন্তু সরলা,শশিমুখীরা সে-দেশেই থেকে যান।

যেখানে রক্তের সম্পর্কিত মানুষগুলো অসময়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেখানে দাদা রাধাকান্তের এক মাস্টারমশাই তাঁদের সাহায্য করলেন। তিনি গোয়ালন্দের স্টিমারে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের। সেই যাত্রার অভিজ্ঞতাও ভয়ংকর! অমানুষিক ভিড়, পশুর মতো গাদাগাদি করে পিণ্ড পাকিয়ে আসা যাত্রীদের শরীর আমাদের মনে করিয়ে দেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র 'মৃত্যুযাত্রা' গল্পের কথা। তপোধীর ভট্টাচার্য যে গল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন,

> 'মৃত্যু-শাসিত ক্ষুৎপীড়িত জীবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দুরাশায় যারা সামাজিক অস্তিত্বের শিকড় ছিঁড়ে পথে বেরিয়েছে, ওরা মনে-মনে অনুভব করে, সমস্ত পথের শেষে কিংবা পথের পাশে ওৎ পেতে আছে মৃত্যু।' (ভট্টাচার্য, ২০১৭; ২৯৪)

-এই অসহায় নারীরা সেই ভাবেই তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে ঘর ছাড়লেন। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় তাঁদের বুকে। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে শিয়ালদহ। কলকাতায় তাঁদের ঠাঁই হলো পিসিমার বাড়ি, তালতলার ডাক্তার লেনে। অণিমা তাঁর স্মৃতি-সংলাপে জানাচ্ছেন- দলে দলে রিফিউজিদের কীভাবে স্টেশন থেকে ট্রাকে তুলে ধুবুলিয়ার ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছিল, সেই কথা। অরবিন্দ পোদ্দার-এর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে কোড করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না-

> 'পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি তকমায় ভূষিত হয়ে বাঙালি উদ্বাস্তুদের জীবন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা শিয়ালদহ স্টেশনে নিত্য বীক্ষ্যমান মানব-জঞ্জালের চিত্র থেকে পুনরায় অনুভব করা যেতে পারে। মনে হবে বিংশ শতাব্দীর এক সভ্য শহরের বুকে আশ্চর্য একটা প্রদর্শনী খুলে দিয়েছে কে। প্রদর্শনী বটে!' (বসু-দত্ত,২০০০; ১৮০)

--না, সুভাষিণীরা সেই পথ ধরেননি। চলার পথে অনেক ভালো মানুষ তাঁরা পাশে পেয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের সেই মাস্টারমশাইয়ের মতোই কলকাতায় সন্তোষমামা। তাঁর সাহায্যেই কৃষ্ণনগরে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা হলো এঁদের। বিরাট বাগানে ঘেরা বসবাসের অযোগ্য মাত্র একটা ঘরবিশিষ্ট বাড়ি। তবু তাতেই এই নারীরা নতুন এক জীবনযুদ্ধের আয়োজন করলেন। টিকে থাকার লড়াই! এদেশে আগে থেকেই বসবাসকারী (বড়দিদির স্বামী) জামাইবাবু কিছুটা বিমুখী, কারণ- ঘরহারাদের যদি সাহায্য করতে হয়! সুভাষিণী এক অপরাজেয় শক্তির ধাত্রী। তিনি সেই অসহায় অবস্থায় বাগানের ডালপাতাকে জ্বালানি করেই মাটির হাঁড়িতে রাঁধা ভাত আর বাগানের সবজি খাইয়ে সকলকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বারবার জীবন হাতে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রিবাটা করার প্রয়োজনে। না, তারপরেও অণিমারা অন্ধকারে থাকেননি। কেবল মাথার ছাদই তো তাঁদের শেষ দাবি ছিল না। তাঁরা কৃষ্ণনগর স্কুলে ভর্তি হন। একযুগ বিভুঁইয়ে এসে যুদ্ধ করে তারপর আবার এঁদের স্বাক্ষরতা অর্জনের লড়াই শুরু হলো। অন্যদিকে প্রবল জেদকে আঁকড়ে রেখে সরলাসুন্দরী সে-দেশেই দুঃস্থ এক আত্মীয়কে সম্বল করে রয়ে গেলেন। তিনি এ দেশে আসেননি। ফলে চতুর্থ প্রজন্মের চোখে যেন একটা যুগের সমাপ্তি হলো এইবার।

তবুও জলের দামে সে দেশের সবকিছু বিক্রি করতে হয়েছিল। বিপিন রায়ের বসতবাড়ি ছাড়াও পঞ্চাশটি ঘর বিশিষ্ট খাজাঞ্চিবাড়ি, ঢাকায় রাধারানির নামে রাখা আরও তিনটি বাড়ি; এসবে সেদিন জোর বা অধিকার ফলানো অসম্ভব ছিল। কারণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির বদল হয়ে গেছে ততদিনে। তবু জাফর সাহেবের মতো এক ভারাটিয়াও তো সে দেশে ছিলেন, যিনি রাধারানিকে 'মা' বলে ডেকেছিলেন? ছিলেন কুলপুরোহিতের সন্তান নরসিংহ চক্রবর্তী। তাঁরাই সে-সব বিক্রিবাটায় এই একা নারী সুভাষিণীকে সাহায্য করেন। মালা তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে জানাচ্ছেন, তাঁর দাদা রাধাকান্ত ঠাকুমা রাধারানিকে প্লেনে তুলে দিলে তিনি একাই খালি পায়ে কলকাতা থেকে ঢাকা যেতেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা ঠিক যেন গল্পের মতো মনে হয়। এরপর একটু একটু করে সময়ের পালাবদল। গড়িয়ার রামগড়ে ১৯৬০ সালে নিজস্ব বাড়ি গড়ে তোলা। তবুও কলকাতার চার দেওয়ালের থেকে অণিমারা আজীবন কৃষ্ণনগরের খোলা মাঠ -নিসর্গকেই ভালোবেসে চলেছেন আজও।

৫

আমাদের ভেবে নিতে হয়, 'দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা' গ্রন্থটিতে লেখক আসলে এমন একটা ন্যারেটিভকে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরছেন, যেখানে শুধু ভাঙন বা বিপর্যয় নেই। তার সঙ্গেই মিশে আছে বিপ্রতীপের স্পর্ধা। অণিমা'রা তাঁর মাকে কখনও মুখ ঢাকা ঘোমটা দিতে দেখেননি, দেখননি পুরুষ মানুষ দেখে তাঁকে পালিয়ে যেতে। যে যুগ আইয়ুব খানের, সেই বিপর্যয়ের কালে দাঁড়িয়েও স্থিতধী সুভাষিণী স্থানীয় এক প্রজা সামেদ মিঞার সহযোগিতায় বাঘৈরের জমিজমা বিক্রি করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই সপ্রতিভ আচরণই তো উত্তর প্রজন্মকে প্রতিস্পর্ধা শিখিয়েছিল। শিখিয়েছিল বেঁচে থাকার ব্যতিক্রমী পাঠ। কমলার স্মৃতি তাই রক্তের লোহিত ইতিহাসকে শুধু মনে রাখেনি। বরং তিনি তাঁর সংলাপের মধ্য দিয়ে আরও এক স্বপ্নময় লাল রঙের আভা স্মৃতির ক্যানভাসে ছড়িয়ে দেন- সেই গ্রামে 'হিন্দু মহিলারা কেউ কেউ বাড়িতে আলতা বানাতো।... একথা মনে আছে, কারণ ওদের হাত সব সময় লাল হয়ে থাকত। আমি ছোটোবেলায় দেখে ভাবতাম এরকম রং কেন

Doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.15812701

হাতের!' (পৃ.৪১) তিনি আরও বলে চলেন মুসলমানপ্রধান সে গ্রামে বুদ্ধ পূর্ণিমার উৎসবের কথা, মাটির মালসায় মুড়কি আর সিন্নি খাওয়ার কথা। আহা! অতীত! এবং খাজাঞ্চিবাড়ির সেই মদনমোহন পুজোয় হরির লুঠের কথা; মালা আজও ভোলেননি। কারণ, ভোলা যায় না বলে।

এরপর বিশ শতকের ছয়ের দশক। চতুর্থ প্রজন্ম রাধাকান্তের আই.এ. পাশ করে চাকরি ও অনেক পরে স্নাতক হওয়া। সুভাষিণীর তখনও একই লড়াই - যে করে হোক দুবেলা এতগুলো মানুষের পেটের ভাত জোগাড় করতেই হবে! মেজ ও সেজ বোন অদম্য জেদে ভর করে স্কুলে ভর্তি হলো। সেখানেই আরও এক ভালোমানুষ ছিলেন। হেডমাস্টারমশাই তাদের দুঃখে সহমর্মী। কানন ও কমলা সাত ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। কমলার শ্বশুর বাড়ি কুমিল্লা হলেও স্বামী কলকাতার বড়ো বাজারে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে আবার স্ত্রীকে কৃষ্ণনগরে ফিরিয়ে আনলেন। অণিমা জানাচ্ছেন , তাঁর সেজদির (কমলার) প্রবল চেষ্টা এবং জেদের দরুণ তিনি সন্তান কোলে নিয়েও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজ। কাননও দুই সন্তানের মা হয়ে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে দাঁড়ানো এক নারী (অণিমা) চাকরির আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে বলছেন - ' আসলে বিয়েটা ওদের পরিচয় বদল ছাড়া তো কিছু দেয়নি,...। তাই চাকরিটা কোনো শখ মেটাতে নয়... একেবারে বাস্তব প্রয়োজনে দরকার ছিল।' সত্যজিৎ-এর 'মহানগর' সিনেমার সেই আরতি ওরফে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মুখটা কি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না?

চতুর্থ প্রজন্ম সাবলম্বী হচ্ছে। কমলা, চতুর্থ সন্ততি টেলিফোন অফিসে চাকরি পেলেন। মালাও। অণিমাও লড়াইয়ে শরীক। দুপুরে বাজারে গেলে কম দামে বাজার মেলে ; সেই পথে তিনি পা বাড়াতেন প্রত্যহ। তবু ভালো থাকতে জানতেন তাঁরা। অণিমার কথায়, কৃষ্ণনগরের সেই অনিশ্চিত জীবনে 'প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও আনন্দে ছিলাম আমরা। একটা মুক্তি ছিল, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার বাতাস ছিল।' (পৃ.৫১) তারপরে একে একে পুরাতনের মুছে যাওয়ার পালা। বড়োমা, দিদিমা চলে গেলেন। কমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন, 'মাঝে মাঝে ভাবি, কী জীবন কাটালেন তাঁরা!...কখনো এতটুকু বিশ্রাম, এতটুকু সেবা পেলেন না।' অথচ তার পরেই তিনি বলেন - হয়তো নিজের দিকে তারা তাকাননি ভালোই করেছেন। কারণ সে-সব নারীদের ব্যক্তিগত জীবনের সঞ্চয় বলতে দুঃখ ছাড়া আর কী-ই বা অবশিষ্ট ছিল? তাঁরা নয়া বসত গড়ে উঠতেও দেখছিলেন এই অসম্ভব যাত্রায়। কৃষ্ণনগরের চৌধুরীপাড়া, অঞ্জনানদীর ধারে রিফিউজিদের নতুন আস্তানা, পাশেই শক্তিনগর; শরণার্থীরাই এখানে নতুন বসতি গড়েছিল।

ছিন্নমূল হওয়া মানে তো কেবল ভেসে যাওয়া নয়, নতুন করে ঘর বাঁধাও। এমন পাঠ এই পুরুষহারা চার প্রজন্মের শিকড়ে বাঁধা পড়েছিল বহুদিন আগেই। তাই শুধু মহানগরের ক্যাকোফোনি নয়, কৃষ্ণনগরের ক্যাথালিক চার্চের স্থাপত্য-গভীরেও অণিমারা তাঁদের শৈশব লুকিয়ে রাখতে পারেন। তাঁদের দারিদ্র্যে ঘেরা উচ্ছিন্ন শৈশব মিশে থাকে কৃষ্ণনগরের সেই রাজবাড়ির বারোদোলের মন্দিরগুলিতেও। তার পাশেই অণিমার স্মৃতিকোঠায় জেগে ওঠে ছোড়দি বিমলার কথা; ঘুমের ঘোরে একদিন যিনি সাধারণ চোর ধরার চিৎকারে আঁতকে উঠেছিলেন- ঢাকার রায়টকে মনে রেখে। অণিমা বলছেন - 'এখন ভাবি,স্মৃতি কীভাবে অবচেতনের ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে থাকে!' (পৃ.৬১) প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা, তবু মনে পড়ে যায় মান্টোর 'খোল দো' গল্পটিকেও। না, চার প্রজন্মের স্মৃতিযাত্রায় এই কমলা- অণিমা- মালা'রা কখনই আনন্দ ভুলে যাননি। লেখকও জানাচ্ছেন, 'আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এলে যা পোড়ার তা তো পুড়ে যাবেই; কিন্তু যা রয়ে যায়, তা খাঁটি।' (পৃ.৬২) এক অসম্ভব অ-সময়ের সংলাপ হয়েও শেষ পর্যন্ত এই টেক্সট্ তাই সেই সব অলিখিত ইতিহাসের দলিলকে বাঁচিয়ে তুলেছে, যেগুলিকে আমরা অ্যানেকডট

বলি। ব্যক্তিগত স্মৃতি-সংলাপের আদলে বিখণ্ডিত ইতিহাসের যে পুনর্লিখন লেখক এই গ্রন্থে গড়ে নিয়েছেন, সে-জন্যও 'দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা' বইটি বহু পাঠ ও আলোচনার দাবি রাখে।

গ্রন্থ পরিচয়

দাস সুর, সুমনা; (২০২০) 'দেশভাগ:স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের নারীরা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, গাঙচিল।
ভট্টাচার্য, তপোধীর; (২০১৭) 'ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান'(পূর্বার্ধ), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।
ভৌমিক, তাপস (সম্পাদনা); (২০১৯) 'ছেচল্লিশের ইতিকথা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, কোরক।
বসু,স্বপন, হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত); (২০০০) 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।